প্রতিধ্বনি the Echo
An Online Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

বিভূতিভূষণ : ইছামতীর ভিন্নধারা

(Bibhutibhushan: Ichamatir Bhinno Dhara)

Sushmita Nath
Asst.Professor, N.C. College, Badarpur, Assam, India
Durgashiv2@gmail.com

Abstract

Bibhutibhushan Bondopadhyay is a prominent writer of Bengali literature. When India as well as Bengal was going through an uncony situation owing to the influence of World War-II Bibhutibhushan appeared with new quiet, natural plot of nature. 'Pather Panchali' is the first novel written by Bibhutibhushan. The novel 'Ichamati' is also widely appreciated by the readers just like his first novel. Some part of this novel was published in the monthly magazine 'Abbhyuday' and in the month of January, year 1950 it is published in the book form. In 'Ichhamati' Bibhutibhushan Bondhopadhyay has described the quiet, natural landscape and also reflected the socio-economic situation of the villages of Bengal very artistically.

বৃহৎ বাংলা কথাসাহিত্য বিশ্বে 'পথের পাঁচালী' দিয়ে বিভূতিভূষণ এর উপন্যাস লেখার যাত্রা শুরু। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে 'পথের পাঁচালীর' মতো 'ইছামতী' উপন্যাসটি পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ সমাদৃত। উপন্যাসটির কিছু অংশ প্রথমে 'অভ্যুদ্ভয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির জন্য বিভূতিভূষণ 'রবীন্দ্রপুরস্কার'ও পেয়েছিলেন। 'ইছামতী' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের শেষ জীবনে লেখা। বিভূতিভূষণ দীর্ঘদীন ধরেই 'ইছামতী' লেখার পরিকল্পনা তাঁর মনে পোষণ করেছিলেন। 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপিতে লিখেছেন,

> "ঠাণ্ডা জলে নাইতে-নাইতে ভাবছিলাম ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি — এইরকম ধূ ধূ বালিয়াড়ি, পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট স্নিগ্ধ ইচ্ছামতীর দুপাড় ভড়ে ঝোপে-ঝোপে কত বন কুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল। গত পাঁচশত বৎসর ধরে কত ফুল ঝরে পড়েছে কত পাখি, কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ পাটা — শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসি-কান্না মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত বৎসরের পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানযাত্রা হ'ল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের খাটের নীচেই। ----------
> -----এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।"

ব্যারাকপুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ইছামতীর দুইতীরে বসতি স্থাপন করা মানুষের সুখ-দুঃখ,

সমাজজীবন এবং নীলকুঠি ও নীলচাষ সংক্রান্ত নানা ঘটনার চিত্র লিপিবদ্ধ 'ইছামতী' উপন্যাসে।

'ইচ্ছামতী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন। যে ইতিহাস রাজা-রাজড়ার জীবন কাহিনি নয়। যুগ-যুগ ধরে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের যে অলিখিত ইতিহাস ইছামতীর মতো বহমান। বিভূতিভূষণ লিখতে চেয়েছেন সে সব ইতিহাস।

> "সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয় কাহিনি নয়।"

'ইছামতী' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের জন্মভূমি ও পল্লী প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালোবাসার পরিচায়ক। 'ইছামতী' উপন্যাসের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুসাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় 'ইছামতী' উপন্যাস প্রসঙ্গে "বিভূতিভূষণকে যেমন দেখেছি" নিবন্ধে লিখেছেন ----- "তাঁর শেষ উপন্যাস একপ্রকার কামনাপুর। বহুকালের কামনা জীবনে ও শিল্পে পরিপূর্ণ হয়। বৃদ্ধ বয়সে সংসার প্রবেশ ও পুত্রলাভ। সে এক পরম উপলব্ধি। সাহিত্য তাকে তিনি পাকা ফসলের মতো গোলায় তুলে রেখেছেন। তাছাড়া ইছামতী নদীকে নিয়ে এপিক উপন্যাস লেখা তাঁর চিরদিনের স্বাদ। নদী এখানে জীবনপ্রবাহের প্রতীক। কাল প্রবাহের প্রতীক। --------- তাছাড়া ইছামতী আর একখানা নীলদর্পন।"

'ইচ্ছামতী' ও 'নীলদর্পণ' উপন্যাস দুটির পটভূমি একই মোল্লাহাটি নীলকুটি। দীনবন্ধু মিত্র ও বিভূতিভূষণের গ্রামের কাছে এই মোল্লাহাটি। এই দুটি উপন্যাসে ঘটনা 'চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার'। ভালো জমিতে চাষিরা নীল চাষ করতে রাজী না হলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই তার উপন্যাসে অত্যাচারের তীব্রতা চরমভাবে প্রকাশিত অন্যদিকে বিভূতিভূষণ জন্মের আগেই নীলকর সাহেবরা ভারতবর্ষ ছেড়ে তাদের দেশে ফিরে যান। তিনি মোল্লাহাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখেন ও গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখ থেকে নীলকর সাহেবদের কাহিনি শুনেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে 'নীলদর্পনের' মতো নীলকর সাহেবদের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত নয়। নর-নারীর প্রেম-প্রীতি, গ্রামের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, তীর্থ যাত্রার বর্ণনা, গৃহস্থের সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবনলেখ্য, গ্রাম্য-ডাকাতের কাহিনি, আধ্যাত্মিকতা ও নিসর্গপ্রীতি প্রভৃতি দৃকপাত হয় 'ইছামতী' উপন্যাসে। বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে বলেছেন -----

> "জগতে অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার, মাঠঘাঠ, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, আলোকময়ী উদার শূন্য — এসব থেকে এমন সব বিপুল, অব্যক্ত, আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে --- সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোনো জ্ঞান পৌঁছয় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক ঐ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায় — শতবর্ষজীবী হলেও পায় না। সাহিত্যকারের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া।"

বিভূতিভূষণের এ ভাবনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' থেকে আরম্ভ করে শেষপর্বে লেখা 'ইছামতীতে'ও। 'ইছামতী' উপন্যাস নদীসংশ্লিষ্ট মানব জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনির সঙ্গে প্রকৃতির মনোগ্রাহী দৃশ্যকে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসটির প্রারম্ভেই বিভূতিভূষণ বর্ণনা দিয়েছেন ইছামতীর তীরিবর্তী অঞ্চল গুলিতে ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতির মনোহর প্রচ্ছদ। ইচ্ছামতীর দুইতীরে বনবনানীতে সবুজের সমারোহ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।

> "নৌকা করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত — দেখতে পাবে দুধারে পলতে মাদার গাছের লালফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, পানার দাম, বুনো

তিৎপল্লা লতার হলদে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাঁচড়া বৈঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিখের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দূর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধুই খো বালির ঘাট, বন কুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গা-কাকলী-মুখর বনান্তসথলী। গ্রামের ঘাটে কোথাও দু'দশখানা ডিঙি নৌকা বাঁধা রয়েছে। কচিৎ উঁচু শিমূল গাছের আঁকাবাঁকা শুকনো ডালে শকুনি বসে আছে সমধিসথ অবস্থায় — ঠিক যেন চীনা চিত্রকারের অঙ্কিত ছবি। ----------"

প্রকৃতির এমন অনুপুঙ্খ বর্ণনা অন্য কোথাও পাওয়া সত্যিই দুর্লভ। উপন্যাসের প্রথমে নালুপাল পান-সুপুরির মোঠ মাথায় করে হাটে চলেছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখি বাবলা গাছের ফুলে ভর্তিডালে বসে আছে নীলুপাল সুপুরির মোট নামিয়ে বিশ্রাম নেয় বনপতি স্নিগ্ধ ছায়া বিশাল বটগাছের নীচে। এখানে প্রকৃতিই হয়ে ওঠে পথিক জনের চিরন্তন নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এছাড়া উপন্যাসে ইচ্ছামতীর তীরে পাঁচপোতার বাঁওড়ের ধারে লেখক কোল্‌সওয়ার্দি গ্রাণ্ট সাহেবের ভ্রমণের দৃশ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে গ্রাম বাংলার নয়ন মনোহর প্রকৃতির রূপকেই উপস্থাপন করেছেন বিভূতিভূষণ। গ্রাণ্ট সাহেব দেখতে পান-----

> "বন্ধনহীন উদাস মাঠের ফুল ভর্তি সোঁদালি গাছের রূপ, ফুল ফোটা বন ঝোপে আজান বন-পক্ষীর কাকলী।"

শরৎকালের আগমনে আউশধানের ক্ষেত ফসল কাটার জন্য শূণ্য পড়ে আছে। তিৎপল্লার হলুদ ফুল বনে বনে ফুটে আছে। উপন্যাসের নায়ক ভবানী বাঁড়ুয্যকে প্রকৃতির এই মুক্ত প্রসারতা আকৃষ্ট করে। মত্রী, নিলু, বিলুর রসিকতায় ভবানীর মন অপ্রসন্ন হলে বা আধ্যাত্ম সাধনার জন্য সে সব সময়ই আশ্রয় নেয় প্রকৃতি মায়ের কোলে। ভবানী নিলু-বিলুদের রসিকতার পর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যে নিভৃত ছায়াভরা বটতলায় এসে বসে সে গাছে দূর দূরান্ত থেকে যাযাবর পাখি শামকূট, হাঁস, সিল্লি, চিল শকুন এসে বাসা বাঁধে। উপন্যাসে ভবানী যখন তাঁর খোকাকে মুড়কি খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন নৌঁকা করে, এখানে বিভূতিভূষণ বর্ষার ইছামতীর তীরের প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত মনোগ্রাহী।

রামকানাই কবিরাজের গ্রহের চারপাশে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে ঘরের পেছনে সোঁদালি গাছে ফুল দোলতে থাকে। বিকেলবেলা গুরু রামকানাই আর শিষ্য নিমাই চক্রবর্তী যখন অধ্যয়নরত তখন বাঁশবনে পিড়িং পিড়িং করে ফিঙে পাখি ডাকতে থাকে। এছাড়া ইছামতীর জলে নিস্তারিণীর অবগাহন দৃশ্যে বিভূতিভূষণ গ্রামবাংলার শান্ত প্রকৃতির মনোমোহন রূপকে এঁকেছেন, যেখানে

> "কূলে-কূলে ভরা ভাদ্রের নদী, তিৎপল্লার বড় বড় হলুদ ফুল ঝোঁপের মাথা আলো করেছে, ওপারের চরে সাদা কাশের গুচ্ছ দুলছে সোনালী হাওয়ায়, নীল বনকলমীর ফুলে ছেয়ে গিয়েছে সাইবাবলা আর কেঁয়ে ঝাঁকার জঙ্গাল, জলের ধারে বনকচুর ফুলের শিষ ----------"

প্রাকৃতিক উপাদানের নিবিড় বিন্যাসে সমগ্র 'ইছামতী' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের নিসর্গপ্রীতির যথার্থ পরিচয় বহন করে। পরিশেষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর ভাষায় বলা যায় --- "আত্মসাহিত প্রশান্তিতে এক করুণার স্নিগ্ধতায় বাংলাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট চিহ্নিত সমুদ্রের মাঝখানে তাঁর দ্বীপটিকে দেখতে এবং চিনতে ভুল হয় না। তাঁর অস্তিবাদী জগতে প্রবেশ করতে পারলে, তাঁর আরণ্যক ধ্যানলোকে মগ্ন হতে পারলে এখনো এমন শান্তি আর সান্ত্বনা মেলে যার সন্ধান অন্যত্র দুর্লভ।"

'ইছামতী' উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পল্লীবাংলার সমাজজীবন ও আর্থসামাজিক অবস্থার নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজে পুরুষরা পড়াশুনা করলেও মেয়েদের জীবন অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। মেয়েরা সে বধু বা কন্যা যেই

হন না কেন তাঁর ঘর গৃহস্থালীর কাজকর্মেই দিনরাত্রি অতিবাহিত হত। মেয়েদের পড়াশুনাকে সুনজরে দেখা হত না কিন্তু কিছু-কিছু পুরুষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নারীরা শিক্ষার্জন করতে পারে। উপন্যাসের নায়ক ভবানী বাঁড়ুয্যের মধ্যে দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষায় প্রবল আগ্রহ। পড়াশুনায় আগ্রহ দেখতে পেয়ে ভবানী বাঁড়ুয্যে স্ত্রী তিলুকে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। পড়াশুনায় উৎসাহিত করে তুলতে তিলুকে কলকাতার মেয়েদের পড়বার জন্য বেথুন সাহেবের স্কুলের কথা বলেন। স্ত্রী বিলুও নিলুর পড়াশুনার প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকায় তাদের উৎসাহিত করতে ভবানী বলেন ---- "মেয়েদের লেখাপড়া শেখার দরকার, শুধু কাঁঠাল খেলে মানব জীবন বৃথায় চলে যাবে। না দেখলে কিছু, না বুঝলে কিছু।"

সে সময় পুরুষরা গ্রাম বাংলার 'মনসামঙ্গাল', 'চণ্ডীমঙ্গাল', 'শিবায়ণ', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' পড়তেন এছাড়া কখনও এ কাব্যগুলি পালাকারে গাওয়া হলে শুনতেন। তখনও গ্রাম বাংলায় বেদ-উপনিষদের চর্চা হত না। তবে দু-একজন ব্যতিক্রমী পুরুষদের দেখতে পাওয়া যায় রামকানাই কবিরাজের মতো। তিনি তাঁর ছাত্রদের শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। তখন পর্যন্তই গ্রামবাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন লোককাব্য বা কাহিনির মধ্যে সীমিত ছিল।

তৎকালীন গ্রামবাংলার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ছিল। বিভূতিভূষণ বলেছেন — "চন্দ্র চাটুর্য্যে গ্রামের আর একজন মাতব্বর লোক। সত্তর-বাহাত্তর বিঘে ব্রয়োত্তর জমির আয় থেকে ভালোভাবেই সংসার চলে যায়।" এছাড়া ফণী চক্রবর্তী, নীলমণি সমাদ্দার, মহরালি মণ্ডল, প্রভৃতিরা সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁদের বাড়িতে কেউ চাকুরীজীবী নয়। দিনের বেলা তারা চাষাবাদের দেখাশুনা করেন এবং সন্ধ্যাকালে চণ্ডীমণ্ডপে নানা বিষয়ে আলোচনা ও তাস, দাবা খেলে সময় অতিবাহিত করেন। রাজরামের মতো নিষ্ঠুর নীলকুটির দেওয়ানদের দেখা যায় যারা প্রজাপীড়ন, খুন, নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য নির্দ্বিধায় প্রজাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত এছাড়া নীলকুঠির আমীন প্রসন্ন চক্রবর্তীর মতো কিছু ব্যক্তিদেরও চোখে পড়ে যাঁরা নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। অন্যদিকে নালুপালের মতো দরিদ্র, কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরও দেখা যায়। আবার দেখা যায় তিলুর মতো কিছু পতিভক্ত পরায়ণা নারী ও নিস্তারিণীর মতো কুলবধু, যে প্রচলিত সংস্কার তথা প্রচলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

গ্রামবাংলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা এক অন্যের সহযোগিতায় উৎসবগুলি সুন্দরভাবে পরিচালিত করে। কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সাধ্যমত গ্রামের মানুষদের নিমন্ত্রণ করে ভুরিভোজন করানো হয়। উপন্যাসে দেখা যায় ভবানী বাড়ুয্যে তার পুত্রের জন্মদিনে গ্রামের লোকেদের ভুরিভোজন করান। এছাড়া ভাদ্রমাসে 'তেরের পালুনি', নামে তাৎপর্যপূর্ণ নারীদের উৎসব গ্রাম বাংলায় হয়ে থাকে। সেদিন বহুপ্রাচীন জিউলি ও কদম গাছের নীচে বনভোজনে মিলিত হয় গ্রামের নারীরা। বাড়ী থেকে যে যার সাধ্যমত খাওয়ার জিনিষ নিয়ে আসে। আর সেখানে সকলে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সকলে একসঙ্গে খায়। উপন্যাসে দেখা যায় নিলুপালের স্ত্রী তুলসী, ভবানী বাড়ুয্যের স্ত্রী তিলু-বিলু এছাড়া নিস্তারিণী ও গ্রাম অন্যান্য নারীরা একত্রে বনভোজন করে। বিভূতিভূষণ গ্রাম বাংলার সমাজ জীবন ছাড়াও পরিবর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে দেখা যায় নালুপাল মামার বাড়ীতে মামীদের অবহেলায় বড় হয়েছে। সে তাঁর মাসীদের কাছ থেকে মাত্র সতেরো টাকা নিয়ে আরম্ভ করেছিল পান-সুপুরির ব্যবসা। এখানে ধীরে-ধীরে ব্যবসা মুখীনতার আভাস পাওয়া যায়।

নালুপালের দোকানে একটি মেয়ে দু'পয়সার তেল আর নুন কিনতে আসে। আরেকটি মেয়ে পয়সার বদলে সে কড়ি নেবে। সে সময় পয়সাও কড়ির দুটিরই প্রচলন ছিল। মেয়েটি কড়ি নিতে চায় কারণ সবাইপুরের হাটে সে শাক-সব্জি কিনবে। তখন এক

পয়সার বদলে ২০টি কড়ি পাওয়া যায়। নালুপালের দোকানের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে একটি মেয়ে শাক নিয়ে যেতে দেখে নালুপাল ছ'কড়া দিতে চাইলে মেয়েটি রাজি হয়নি। তারপর দবিরুদ্দি লাউ নিয়ে যেতে দেখে লাউয়ের দাম জিজ্ঞেস করায় জানতে পারে দু'পয়সা এক একটা। শেষপর্যন্ত দরাদরি করে এক পয়সা পাঁচ কড়ায় দুটো লাউ কিনে নেয় নালুপাল। বৃদ্ধ হরিনাপিত লাউয়ের দাম শুনে বলে মোল্লাহাটির হাটে এধরনের লাউ সে জনসন সাহেবের আমলে ছ'কড়া দিয়ে কিনেছে। এছাড়া হরিনাপিত জানায় পার্শ্বনাথ ঘোষের বড় ছেলের বউভাতের এক টাকা দামে নানা ধরনের একগাড়ি শাকসব্জি আসে। একথার প্রেক্ষিতে অঙ্কুর জেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে ---

> "না। মানুষের খাবার দিন চলে যাচ্ছে, আর খাবে কি? এই সবাইপুরের দুধ ছিল ট্যাকায় বাইশ সের চব্বিশ সের। এখন আঠারো সেরের বেশি কেউ দিতে চায় না।"

অঙ্কুর মাঝির ছেলে বড় মাছ ধরেছিল, সে মাছটি বিক্রি করে সাড়ে তিন টাকায়। যারা মাছটি কিনেছে সকলেই অসুখী। কেননা অঙ্কুর মাঝিকে এরা বেশি ঠকাতে পারেনি। এই মাছের দাম হাটে যা তার থেকে কম পেয়েছে আনা আটেক। উপন্যাসে এসব বর্ণনার মধ্যদিয়ে তৎকালীন গ্রামবাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

গ্রামবাংলার সকলেই কৃষিনির্ভর। গ্রামের দু-একজন চাকুরীজীবী রয়েছে। রূপচাঁদ মুখুয্যের বড় ছেলে যতীন। সে মাইনে পায় ৫.০০ (পাঁচ) টাকা। আর রাজারামের দূর সম্পর্কে ভাইপো শম্ভুরায় আমুটি কোম্পানীতে চাকুরী করে। যদিও তাঁর মাইনে কত জানা যায়নি। সে সময় গ্রাম বাংলায় গৃহস্থ ছাড়া হলা পেকে বা অধরমুচি নামে কিছু দস্যু ডাকাতদের দেখতে পাওয়া যায় যারা গ্রামের ধনীব্যক্তিদের বাড়ি লুঠ করে প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে অন্ন যোগায়। তারা খুন, ডাকাতি করে জেলে যায়। সেখানেই ভাল থাকে তারা। কেননা সেখানে ভাতের চিন্তামুক্ত। অধরমুচি বলেন ----

> "গেরামে যা দেখছি, চালের কাঠা দু'আনা দশ পয়সা। তাতে আর কিছুদিন গারদে থাকলি হতো ভাল। খাবো কেমন করে অত আক্রাচালের ভাত? ছেলে-পিলেরে বা কি খাওয়াবো।"

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে মুদ্রা ব্যবহারের পরিবর্তন এল। পূর্বের মতো হাটে আর কড়ি চলছে না। তিলু স্বামী ভবানী বাঁড়ুয্যকে বলছে--- "আজকাল আবার কড়ি চলচে না হাটে। বলে, তামার পয়সা দাও।"

এভাবে 'ইছামতী' উপন্যোসে বিভূতিভূষণ গ্রামবাংলার প্রত্যেক রূপকে তাঁর তুলিকার কুশলীটানে এঁকেছেন।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন (বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস) — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ — জুলাই ১৯৯৪, দেজ পাবলিশিং।
২. বাংলা সাহিত্য পরিচয়, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ — ২৬শে আগষ্ট ১৯৯৯।
৩. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ — ১৯৬৬, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।
৪. বিভূতিভূষণের ইছামতী, অধ্যাপক মদনমোহন সরকার, প্রথম প্রকাশ — ১৩৯৫, প্রজ্ঞা বিকাশের পক্ষে।
৫. শ্রী সৌরেন বিশ্বাস, 'বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা (আষাঢ় ১৩৯৭) জুলাই ১৯৯০।